ভাবসম্প্রসারণ, সারাংশ/সারমর্ম

ইউনিট ৯

ইউনিটের উদ্দেশ্য

- ভাবসম্প্রসারণ, সারাংশ/সারমর্ম এর পার্থক্য নির্ধারণ করতে পারবেন।
- ভাবসম্প্রসারণ, সারাংশ/সারমর্ম রচনার প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জন করবেন।

পাঠ ১

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি–

- ভাবসম্প্রসারণের বিভিন্ন দিক সর্ম্পকে অবহিত হবেন।
- ভাবসম্প্রসারণ রচনার দক্ষতা অর্জন করবেন।

ভাবসম্প্রসারণ শব্দের অর্থ ভাব বা বক্তব্যকে সম্প্রসারণ বা দীর্ঘায়িত করা। সাহিত্যের সঙ্গে ভাবের একটি সম্পর্ক আছে। ভাব ছাড়া সাহিত্য হয় না আর সাহিত্য ছাড়া ভাব প্রকাশ করা যায় না। লেখক ও কবি ভাষার কারিগর। ভাষার মাধুর্য ও দীপ্তি সৃষ্টিতে তাঁরা তৎপর। যথার্থ ভাবের সঙ্গে যখন যথার্থ ভাষার সম্মিলন হয় তখনই তা হয় অপূর্ব সৃষ্টি। এ সৃষ্টির সৌন্দর্য উজ্জ্বলতা, প্রভাব ইঙ্গিতময়তা ও ব্যঞ্জনা পাঠকের মনকে করে আলোকিত ও উদ্দীপ্ত। একটি বাক্যের গভীরতর অর্থের মধ্যে লুকিয়ে থাকতে পারে গভীর ভাবের বীজ। এ বাক্যটিকে বিশ্লেষণ করলে পাওয়া যায় ভাবের প্রকৃত তাৎপর্য।

ভাবসম্প্রসারণ শব্দের অর্থ ভাবের সম্প্রসারণ করা বা বিস্তৃত করা। ভাবময় দীপ্তিতে উজ্জ্বল বাক্য বিশ্লেষণ করলে যে নানাবিধ বক্তব্য ও বক্তব্যের বিশ্লেষিত রূপ পাওয়া যায় তাই ভাবসম্প্রসারণ। বাক্যের অস্ফুট তাৎপর্যকে বিস্তারিতভাবে প্রকাশ করার নামই ভাবসম্প্রসারণ।

ভাবসম্প্রসারণ করার জন্য নিম্নলিখিত নিয়মগুলো মেনে চলুন

১. প্রদত্ত অংশটি বারবার পড়ুন ও মূলভাব ও তাৎপর্য বুঝবার চেষ্টা করুন।
২. প্রত্যেকটি শব্দের অর্থ জানার চেষ্টা করুন ও উপমা, রূপক ও অলঙ্কার বুঝবার চেষ্টা করুন।
৩. কবি/লেখকের নাম অথবা অমুক বলেছেন- এ সব লিখবেন না।
৪. প্রদত্ত অংশটির সাধারণ অর্থ লিখুন পরে তার মূল তাৎপর্য।
৫. মূলভাবকে ারষ্ট করার জন্য দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করতে পারবেন।
৬. ভাবের পরম্পরা যুক্তিসহ লিখুন।
৭. অপ্রাসঙ্গিক কোন কথা লিখবেন না ও পুনরাবৃত্তি করবেন না।
৮. প্রারম্ভিক বাক্যটি শ্রুতিমধুর ও মুল লক্ষ্য অভিমুখী করে প্রয়োগ করুন।
৯. প্রবাদ প্রবচন, উক্তি ব্যবহার করতে পারেন তবে তা হতে হবে নির্ভুল।
১০. ভাবসম্প্রসারণের বাঁধা ধরা আয়তনের কোন নিয়ম নাই। মোটামুটি দশ থেকে পনেরটি বাক্য লিখুন।

নমুনা

কাঁটা হেরি ক্ষান্ত কেন কমল তুলিতে,
দুঃখ বিনা সুখ লাভ হয় কি মহীতে?

উপরের কবিতার লাইন দুটি পড়ুন। নিম্নরেখ শব্দগুলোর অর্থ জানা আছে কিনা দেখুন। যদি জানা না থাকে তবে লাইন দুটি বারবার পড়ে ও চিন্তা করে দেখুন সম্ভাব্য অর্থ কি হতে পারে? পরে অর্থগুলো মিলিয়ে দেখুন, আপনার উত্তর কতটুকু ঠিক হয়েছে?

হেরি – দেখে, দেখিয়া
ক্ষান্ত – বিরত, থেমে থাকা
কমল – পদ্মফুল
বিনা – ছাড়া, ব্যতীত
মহীতে – পৃথিবীতে

এখন কবিতাংশটি আক্ষরিক অর্থ লিখতে হবে। সেটি এরকম হতে পারে।

কমল বা পদ্মফুল অত্যন্ত সুন্দর। বাংলাদেশের বিল, ঝিল, দিঘি, সরোবরে প্রচুর পদ্মফুল ফোটে। প্রস্ফুটিত পদ্মফুলের সৌন্দর্যে মনে হয় জলাশয়গুলো হাসছে। পদ্মফুলের সৌন্দর্যে এগুলো সংগ্রহ করার আগ্রহ জাগা স্বাভাবিক। কিন্তু এগুলো সংগ্রহ করা কঠিন। প্রথমত, পদ্মফুল সংগ্রহ করতে হলে পানিতে নামতে হবে, দ্বিতীয়ত, পদ্মফুলের মৃনাল বা ডাঁটা থাকে কাঁটায় ভরা। পদ্মফুল নিতে হলে তাই সইতে হয় কাঁটার আঘাত। পদ্মফুল যত সুন্দরই হোক তাকে পেতে হলে পানিতে নামার কষ্ট, সেই সঙ্গে কাঁটার আঘাত সইতে হবে।
দু:খ আর সুখ – দুটোর অবস্থানই কাছাকাছি। পৃথিবীতে দুঃখ ছাড়া সুখ লাভ করা যায় না।

বিশেষ অর্থ এরকম হতে পারে–
পৃথিবী কঠিন কর্মক্ষেত্র। কঠিন জীবন সাধনার মধ্য দিয়েই এখানে সাফল্য আসে। বিনা পরিশ্রমে, বিনা কষ্টে এখানে কোন কিছুই অর্জন করা যায় না। জীবন কুসুম শয্যা নয়। জীবনের প্রতি পদে আছে দুঃখ-কষ্ট ও ব্যর্থতার চোরাবালি। কিন্তু তাই বলে জীবন পথের পথিক থেমে থাকে না। জীবনে শ্রেষ্ঠত্ব ও সাফল্য অর্জন করা যাঁদের ব্রত তাঁরা বন্ধুর পথ ও দুঃখ কষ্টকে স্বীকার করে নিয়েই পথ চলেন। আর এ মনোভাব ও মনোবলের কারণেই তাঁদের জীবনে আসে সার্থকতা ও সাফল্য।

"কে লইবে মোর কার্য? – কহে সন্ধ্যারবি
শুনিয়া জগৎ রহে নিরুত্তর ছবি।
মাটির প্রদীপ ছিল, সে কহিল স্বামী,
আমার যেটুকু সাধ্য করিব তা আমি।"

সারাদিন পৃথিবীতে আলো বিকিরণ করেছে সূর্য। সন্ধ্যার সময় হয়েছে তার অস্ত যাবার। কিন্তু এখন পৃথিবীকে কে আলো দান করবে? সূর্যের দায়িত্ব কেউ নিল না। জগৎ উত্তরহীন হয়ে রইলো। শুধু মাটির প্রদীপ। যার আলো দেবার ক্ষমতা খুবই কম, সে নিজের সাধ্য অনুযায়ী কাজ করার সম্মতি দিল। সূর্য প্রকান্ড, তার ক্ষমতাও বিপুল। সূর্য সারাদিন আলো দিয়ে মানুষ ও জীবজগৎকে সচল রাখে। পৃথিবীতে আরও অনেক বড় বড় শক্তি আছে। আকাশারর্শী পর্বতচূড়া আছে, দুর্গম অরণ্য, বিশাল সমুদ্র আছে– কিন্তু কেউই পৃথিবীকে আলো দিতে পারে না। বিশাল আকৃতি হয়েও সূর্যের দায়িত্বভার তারা নিতে পারে না। তাই সকলেই নিরুত্তর ও লজ্জায় মলিন। সেই মুহূর্তে ক্ষুদ্র দীপ শিখা তার ক্ষুদ্র শক্তি নিয়ে এগিয়ে এসেছে।

মানুষের ও সমাজের কল্যাণ সব মানুষই করতে পারে। লোক সেবার আগ্রহটাই এখানে বড় ব্যাপার। অনেক বড় মানুষ যা পারেন না– একজন সামান্য মানুষও তা করতে পারেন। একজন ধনী মানুষ যে কাজে ভয়ে পিছিয়ে যায় মহৎ উদ্দেশ্য থাকলে সে কাজে একজন সাধারণ দীন মানুষও সফল হতে পারেন। মহৎ ইচ্ছা থাকলে ক্ষুদ্র হয়েও মানুষের জন্য অশেষ কল্যাণকর কাজ করা যায়। পরের মঙ্গল কামনা ও কল্যাণ সাধনের ব্রত থাকলে সামান্য মানুষকে দিয়েও মানব সমাজের অসামান্য প্রয়োজন মিটাতে পারে।

অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে
তব ঘৃণা তারে যেন তৃণসম দহে।

যে অন্যায় করে ও যে নির্বিচারে অন্যায়কে সহ্য করে দুজনই সমান অপরাধী। বিধাতার ঘৃণা যেন দুজনের উপরেই সমানভাবে বর্ষিত হয়। অন্যায় আচরণকে সহ্য করার মধ্যে কোন মহত্ত নাই। ক্ষমা নিঃসন্দেহে মানব চরিত্রের একটি মহৎ গুণ। কিন্তু নিজের দুর্বলতা ঢেকে রাখার জন্য যদি ক্ষমা করা হয় তবে তা হয় চরিত্রের দুর্বলতা। সহনশীলতা তখন ব্যর্থতারই নামান্তর হয়। অন্যায়কারীর অন্যায়ের প্রতিবাদ না করলে অন্যায়কারী প্রশ্রয় পায় ও তার অত্যাচার ক্রমশ বেড়ে যায়। অত্যাচারে প্রতিবাদ করতে পারাটাই সেখানে প্রয়োজন। অন্যায় যে করে সে দোষী এবং ঘৃণিত কিন্তু যার উপরে অন্যায় করা হচ্ছে সে যদি সহনশীলতা ও ক্ষমার নামে তা সহ্য করে যেতে থাকে তবে অত্যাচারিতও হবে সমান হারে দোষী। পৃথিবীর সকল ধর্মেই সহনশীলতা ও ক্ষমার কথা বলা হয়েছে। পাশাপাশি অন্যায়ের প্রতিবাদের কথাও বলা হয়েছে। অন্যায়কারীকে প্রতিহত করার যার ক্ষমতা আছে তিনিই মাত্র প্রয়োজনে ক্ষমা করতে পারেন। ভীরু ব্যক্তির জন্য ক্ষমা দুর্বলতামাত্র। বিধাতার দৃষ্টিতে অন্যায়কারী ও অন্যায় সহ্যকারী দুজনেই সমান অপরাধী। বিধাতার কাছে দুজনই ঘৃণিত।

কেরোসিন শিখা বলে মাটির প্রদীপে
ভাই বলে ডাকো যদি গলা দিব টিপে
হেনকালে গগনেতে উঠিলেন চাঁদা
কেরোসিন শিখা বলো – এস মোর দাদা।

কেরোসিন শিখা ও মাটির প্রদীপ উভয়েরই কাজ আলো বিতরণ করা। সেদিক থেকে তার একই শ্রেণীভুক্ত। তবে মাটির প্রদীপের চাইতে কেরোসিন শিখা জোরালো এবং বেশি জায়গায় আলো ছড়ায়। কেরোসিন শিখা প্রদীপ্ত কিন্তু মাটির প্রদীপের আলো নিস্প্রভ ও ম্লান। দুজনের উদ্দেশ্য একই – অন্ধকার দূর করা। তবে তাদের কাজের মাত্রা ভিন্ন। কিন্তু কেরোসিন শিখা মাটির প্রদীপকে সমগোত্রীয় ও আত্মীয় বলে মনে করে না। কেরোসিন শিখার মধ্যে আছে বড়ত্বের অহঙ্কার ও গর্ববোধ।

রাতের বেলা চাঁদ পৃথিবীকে তার স্নিগ্ধ আলো দান করে। বহু দূরবর্তী উজ্জ্বল চাঁদকে কেরোসিন শিখা তার সমগোত্রীয় ও আত্মীয় বলে মনে করে। তাই আকাশে চাঁদ উঠলেই কেরোসিন শিখা তাকে সাদর সম্ভাষণ জানায়। চাঁদের সঙ্গে বন্ধুত্ব

ও আত্মীয়তা গড়তে কেরোসিন শিখার আগ্রহের কোন অভাব নেই। কিন্তু পৃথিবীর সমগোত্রীয় ক্ষুদ্র মাটির প্রদীপের প্রতি অবহেলা দেখায় ও অস্বীকার করে।

কেরোসিন শিখার এ ব্যবহার মানব সমাজেও দেখা যায়। কিছু মানুষ আছে যারা দরিদ্র ও হীনাবস্থায় পতিত মানুষকে অস্বীকার করে। হয়তো তাদের কেউ তার নিকটাত্মীয় কেউ প্রতিবেশি। কিন্তু তাদেরকে অবহেলা করে দূরের ধনী-মানী, ক্ষমতাশালী লোককে আপনজন হিসাবে বিবেচনা করে ও আত্মীয় বলে পরিচয় দেয়। এরকম মনোভাব যে সব মানুষের তারা কখনও সৎ নয়। তাদের অবিবেচনা ও বিকৃত রুচির জন্য মানব সমাজে ধিকৃত হয়ে থাকেন।

বিপদে মোরে রক্ষা কর, এ নহে মোর প্রার্থনা
বিপদে আমি না যেন করি ভয়।
দুঃখ তাপে ব্যথিত চিতে নাই বা দিলে সান্ত্বনা
দুঃখ যেন করিতে পারি জয়।

পৃথিবীর পথ কুসুমাস্তীর্ণ নয়। জীবন পথে চলতে গেলে অনেক বাধা-বিপত্তি, বিঘ্ন ও বিপদ আছে। সংসারের দুঃখ দৈন্যকে অস্বীকার করে জীবন পথে চলতে হয়। জীবনের বাঁকে বাঁকে লুকিয়ে আছে বিপদের নানা ক্ষেত্র। তাই বলে জীবন সংগ্রামে মানুষ কোন দিন পিছপা হয়নি। বিপদের সঙ্গে বোঝাপড়া করেই মানুষ পৃথিবীতে টিকে আছে। সুখ আর দুঃখ জীবনের এপিঠ আর ওপিঠ। দুঃখের ভয়ে জীবন থেকে পালিয়ে যাওয়া মানুষের আদর্শ হতে পারে না। তাই জীবন যুদ্ধে মানুষ কখনও পলাতক নয়। মানুষ মাত্রই জীবনবাদী।

একারণেই বিধাতার কাছে কবির প্রার্থনা – বিপদ থেকে আমরা ভয়ে যেন পালিয়ে না যাই। বিপদের সঙ্গে লড়াই করে আমরা বাঁচতে চাই। সেই সঙ্গে আরও প্রার্থনা ,দুঃখ, কষ্ট, ব্যথা-সান্ত্বনার দরকার নাই। বরং আমরা চাই যেন নিজের প্রাণশক্তি দিয়ে দুঃখ, তাপকে কষ্ট ও ব্যথাকে পরাজিত ও উপেক্ষা করতে পারি।

ধ্বনিটিরে প্রতিধ্বনি সদা ব্যঙ্গ করে
ধ্বনির কাছ ঋণী সে যে পাছে ধরা পড়ে।

ধ্বনি বা শব্দ থেকেই প্রতিধ্বনি বা প্রতিশব্দ সৃষ্টি হয়। ধ্বনিটি আসল, প্রতিধ্বনি নকল। ধ্বনির জন্ম না হলে প্রতিধ্বনির সৃষ্টি হতো না। তাই প্রতিধ্বনি ধ্বনির কাছে ঋণী। এই ঋণ যেন অন্যের কাছে ধরা না পড়ে সেজন্য প্রতিধ্বনি দূর থেকে ধ্বনিকে বারবার ব্যঙ্গ করে। নিজের ঋণকে অস্বীকার করার জন্য ও নিজের জন্মরহস্য যেন অন্যের কাছে ধরা না পড়ে সেজন্য সে সদা তৎপর। প্রতিধ্বনি প্রচার করতে চায় সে স্বয়ংসম্পূর্ণ-সৃষ্টি তার স্বাভাবিকভাবে। উপকারীর উপকারকে অস্বীকার করার মধ্যে প্রতিধ্বনির ক্ষুদ্রতা সহজে ধরা পড়ে।

মানুষের সমাজেও একশ্রেণীর লোক দেখা যায় যারা উপকারীর উপকার প্রসন্নচিত্তে গ্রহণ করতে পারে না। মানুষের সমাজে একজন মানুষ অন্য মানুষের উপর নির্ভরশীল হবে এটাই স্বাভাবিক। মানুষের মধ্যে যদি মানবিকতা, দয়াশীলতা অন্যের উপকার করার চেতনা – যদি না থাকত তবে মানুষ সমাজে বসবাসের উপযোগী থাকতো না। কোন কিছুর প্রত্যাশা না করেই মহৎ ব্যক্তি অন্যের উপকার করে। কিন্তু যদি উপকৃত ব্যক্তি যদি সে উপকার বা ঋণকে অস্বীকার করে, তবে তা হবে মারাত্মক অপরাধ। ঋণ স্বীকার করলে উপকৃত ব্যক্তিটির সমৃদ্ধি ও প্রতিষ্ঠা ক্ষুণ্ন হয় না। নিজের প্রয়োজনটি ফুরিয়ে গেলে অনেকেই কৃতঘ্নতার পরিচয় দেয়। উপকারী ব্যক্তির ক্ষতি ও সুনাম নষ্ট করার জন্য উঠে পড়ে লাগে। তাতে অবশ্য মহৎ ব্যক্তির কোন ক্ষতিই হয় না। মহৎ ব্যক্তিকে ছোট করতে যেয়ে কৃতঘ্ন ব্যক্তি নিজের হীনতাকেই আরও বেশি করে প্রকাশ করে দেয়।

পুষ্প আপনার জন্য ফোটে না। পরের জন্য তোমার হৃদয় কুসুমকে বিকশিত করিও।

পুষ্পের সৌন্দর্যে আমরা মুগ্ধ হই। তাই পুষ্প বা ফুল মানুষ মাত্রেরই প্রিয়। পুষ্পের বুকে পরবর্তীকালে বেঁচে থাকার জন্য বীজ থাকে বটে; তবে বীজধারণই পুষ্পের প্রধানতম উদ্দেশ্য নয়। পুষ্পের সুরভি ও সৌন্দর্য প্রকৃতির অসামান্য দান। ফুলের সৌন্দর্য ও সুগন্ধ মানুষকে মোহিত করে। যে মানুষ নিজে ফুলের সুবাস নিতে ভুলে যায়, বাতাস তাকে পৌঁছে দেয় ফুলের বার্তা – ফুলের গন্ধ। ফুলের সুগন্ধ ও সৌন্দর্য কিছুই তার নিজের জন্য নয়। সবই অন্যের মনোরঞ্জনের জন্য-অন্যের ভাল লাগার জন্য।

পুষ্পের ফোটার সঙ্গে মানুষের হৃদয় কুসম বিকশিত হওয়ার একটি সাদৃশ্য বা মিল আছে। যে মানুষ মহৎ, যার মন বিকশিত হয়েছে – ফুলের মতই তার হৃদয়ও সুবাস ছড়ায়। মানুষের উপকারে লাগাটাই জীবনের শ্রেষ্ঠ কর্ম। আত্মকেন্দ্রিক মানুষ যে নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত, নিজের স্বার্থ উদ্ধারই যার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য সে প্রকৃত মানুষ নয়। মহৎ কর্মে যে মানুষটি নিয়োজিত, অন্য মানুষের বিপদ আপদে যে নিজের বুক পেতে দেয় – এমন মানুষকেই সমাজ কামনা করে। মানুষের আদর্শ হওয়া উচিত ফুল। ফুল নিজের জন্য নয় অন্যের জন্য তার নিজের যা ঐশ্বর্য অকাতরে বিলিয়ে দেয়। মানুষেরও তেমনি উচিত নিজের কথা চিন্তা না করে অন্য মানুষের উপকারে নিজেকে বিলিয়ে দেওয়া। তাই ফুল যেমন ধীরে ধীরে বিকশিত হয় তেমনি মানুষের হৃদয় কুসুমকেও বিকশিত করতে হয়।

মন সজীব রাখিতে হইলে বিস্ময়বোধ জাগ্রত রাখিবে।

পৃথিবীর পাঠশালায় বিস্ময়কর বস্তুর অভাব নাই। আমরা যেদিকে তাকাই সেদিকেই দেখতে পাই অফুরন্ত বিস্ময়কে। প্রকৃতির মধ্যে সামান্য তৃণ থেকে প্রাণীকুলের জীবনধারণের যে আনন্দ সুদূর আকাশে গায়ে নক্ষত্রলোক পর্যন্ত যে রহস্যময়তা সর্বত্রই এক অলৌকিক আনন্দ বিরাজিত। মানুষ পৃথিবীর এক দুর্বল ছোটখাট প্রাণীমাত্র। কিন্তু সে বুদ্ধিমান প্রাণী। আর এ বুদ্ধি জাগ্রত হয়েছে তার বিস্ময়বোধ বা কৌতূহল থেকে। মানুষের মধ্যে যদি কৌতূহল ও বিস্ময়বোধ না থাকত তবে বুদ্ধিবৃত্তি জাগ্রত হত না। শিশুকে যেমন আমরা দেখি – অপার বিস্ময়বোধ নিয়ে প্রথমে তার পরিবেশ তারপর বিশাল পৃথিবীকে ক্রমশ বিস্ময়ের দৃষ্টিতে দেখতে থাকে। মানুষ একদিকে চিরশিশু। মহাবিশ্বের মহারহস্যের প্রায় কিছুই মানুষের এখনও জানা নেই। বিস্ময়বোধে মানুষের একরকম আনন্দ আছে। বিশ্বের অপরূপ সৌন্দর্য, রূপ ও শোভা মানুষকে মুগ্ধ করে। সৃষ্টিকর্তার অপার মহিমা মানুষকে বিস্মিত করে।

মানুষের বিস্ময়বোধ যতদিন জাগ্রত থাকে ততদিনই মানুষ পদবাচ্য। যে মানুষের আর কিছু জানার নেই, অনুভব করার শক্তি যে মানুষের নেই সে মানুষ মৃত মানুষের শামিল। মনকে রাখতে হয় সজীব ও সচল। যখন মানুষের মন মরে যায় তখন সেখানে আর কৌতূহল ও বিস্ময়বোধ থাকে না। অল্প বয়সেই মনের মৃত্যু ঘটতে পারে। মনের এ মৃত্যুকে রোধ করতে হলে মনকে রাখতে হয় সজীব ও টাটকা। আর মানুষের মন ততদিনই সজীব থাকে যতদিন তার মধ্যে থাকে বিস্ময়বোধ ও কৌতূহল। মানুষের মন থেকে যেদিন সমস্ত রকমের কৌতূহল বিলুপ্ত হয় সেদিনই প্রকৃত মৃত্যু ঘটে যায়। জীর্ণদেহেও সজীব মন থাকতে পারে যদি সেখানে কৌতূহল চির জাগ্রত থাকে। অজানাকে জানার আগ্রহই মানুষের জীবনের চলার একমাত্র সঙ্গী।

নদীর এপার কহে ছাড়িয়া নিঃশ্বাস
ওপারেতে সর্বসুখ আমার বিশ্বাস
নদীর ওপার বসি দীর্ঘশ্বাস ছাড়ি
কহে, যাহা কিছু সুখ সকলি ওপারে।

নদী নিরবধি বয়ে চলে। নদীর এপার আর ওপার – কখনও এক হবার নয়। সমান্তরাল রেখার মত দুইপার নির্দিষ্ট ব্যবধানে যেন ছকে বাঁধা। নদীর দুইপারে শহর বন্দর গ্রাম। সেখানে নানা মানুষ জীবন তাদের হাসিকান্না আনন্দ বেদনায় পরিপূর্ণ। জীবনের কোলাহল দুই তীরেই অভিন্ন। তারপরও নদীর এপারের মানুষ বেদনার নিঃশ্বাস ত্যাগ

করে। মনে করে ওপারেই যত সুখ আনন্দ কোলাহল জীবনের উচ্ছ্বাস। অনুরূপভাবে ওপারের মানুষ মনে করে – নিজেদের জীবন হতাশায় নিমগ্ন – যতসুখ আর আনন্দ সবই ওপারে। নদীর এপারের মানুষও সুখী নয় – ওপারের মানুষও সুখী নয়। দুইপারের লোকই ভাবে তারা দুঃখী। দূরের বাদ্যি-বাজনা মধুর শোনায়। তেমনি দূরের জীবনযাত্রাও মধুর মনে হয়। কাছের জগৎ নিরেট বাস্তব, দূরের জগৎ স্বপ্নময় ও মধুময়। দূরের জগৎই মানুষের কাছে চিরদিন – "ছায়াসুনিবিড়। শান্তির নীড়"।

প্রত্যেক মানুষের জীবনে কিছু না কিছু অতৃপ্তি থাকে। তাছাড়া মানুষ নিজেকে দুঃখী ও অন্যকে সুখী ভাবতে অভ্যস্ত। সুখ-দুঃখবোধ নিতান্তই আপেক্ষিক ব্যাপার। তারপরও অন্যের প্রতি প্রচ্ছন্ন ঈর্ষা একটা অশুভ প্রতিযোগিতার সৃষ্টি করে। অন্যের চেয়ে ধন সম্পদ বিত্ত অনেক সময় বেশি থাকলেও পরের সম্পদের উপর লোভ-লালসা থাকে পুরোমাত্রায়। কাল্পনিক একটা অভাববোধ মানুষের হৃদয়কে মাঝে মাঝে এমন গ্রাস করে ফেলে যে সে অন্যকে তার চেয়ে সুখী ও সম্পদশালী ভাবতে থাকে। এই অতৃপ্তি অভাববোধ মানুষকে শান্ত ও স্থির হতে দেয় না। এ মনোভাব তাকে চিরকাল তাড়িত করে – যেখানে জীবনের ভাগ্যে জড় হয় অতৃপ্তি আর অবিশ্বাস – ঈর্ষা আর বিদ্বেষ।

বন্যের বনে সুন্দর, শিশুরা মাতৃক্রোড়ে।

সৌন্দর্য নির্দিষ্ট আধার বা অবয়বকে অবলম্বন করে বিকশিত হয়। সৌন্দর্য দেখা ও উপভোগ করার জন্য দৃষ্টি ও মনি থাকা প্রয়োজন। মানুষ স্বভাবত সৌন্দর্য প্রিয়। কিন্তু সব সৌন্দর্যই সকল মানুষকে সমান আকৃষ্ট করে না। ফুলের সৌন্দর্য সার্বজনীন। এতে আকৃষ্ট হয় না এমন লোক খুঁজে পাওয়া হয়তো ভার। কিন্তু বন্যজন্তুর হিংস্রতা ও ক্ষিপ্রতা, উদ্ধত ভঙ্গিতে যে সৌন্দর্য আছে তা হয়তো সবাই খুঁজে পায় না। অরণ্য ও বনের একটি সৌন্দর্য আছে। এমন কি অরণ্যবাসী বন্য জীব জন্তুরও একটি সৌন্দর্য আছে। না হলে মানুষ অরণ্যে বিচরণশীল বন্য জীবজন্তু দেখতে যায় কেন? তবে এখানে মনে রাখা দরকার বন্য সৌন্দর্য বনেই মানায় ভাল সেখানেই সৌন্দর্যের প্রকৃত বিকাশ। চিড়িয়াখানায় লোহার খাচায়, বন্যপ্রাণী আটকে রাখা যায় বটে। কিন্তু সেখানে বন্য সৌন্দর্যের প্রকৃত প্রকাশ ঘটে না।

সৌন্দর্যের আধার সম্পর্কে আর একটি উদাহরণ দেওয়া যায়। শিশুরা আমাদের খুব প্রিয়। আর শিশুর সবচেয়ে নিরাপদ আশ্রয় তার মা। মায়ের কোলে শিশু যখন হাত পা নেড়ে খেলে তখন এ দৃশ্যটি আমাদের মন ও চোখকে বেশি তৃপ্তি দেয়। শিশু যদি হয় অযত্নেলালিত, যদি শিশুটি অবহেলায় পড়ে থাকে তবে সে শিশুকে দেখে আমরা আনন্দিত হইনা বড়জোর শিশুর জন্য কৃপাবোধ জাগে।

চিড়িয়াখানায় বন্দী বন্যপ্রাণীর যেমন বন্য সৌন্দর্য ক্ষুণ্ন হয় তেমনি মাতৃক্রোড়হীন অনাদৃত শিশুর মধ্যেও আমরা প্রকৃত সৌন্দর্য খুঁজে পাইনা। তাই একথা যথার্থ যে বন্যদের বনের মধ্যে শোভন আর শিশুরা শোভন মায়ের কোলে।

১
শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড

সঙ্কেত ঃ শিক্ষা কি , শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা কি? শিক্ষা মানুষকে কিভাবে প্রকৃত মানুষ করে তোলে। অশিক্ষার কুফল কি- অশিক্ষা মানুষের জীবনযাত্রাকে কিভাবে অনুন্নত করে রাখে। পৃথিবীব্যাপী মানব-জাতির উন্নতিতে শিক্ষা কিভাবে ভূমিকা রেখেছে। জাতীয় উন্নতির জন্য শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা। একটি জাতি কতটুকু উন্নত তা তার শিক্ষার মান দেখেই বোঝা যায়। শিক্ষার কোন বিকল্প নাই।

২
সততাই সর্বোৎকৃষ্ট নীতি

সততা কি – সততা কিভাবে মানুষের মনে আস্থা সৃষ্টি করে। দুর্নীতিহীন সাধুতা জীবনের জন্য প্রয়োজন। সততার জন্য দুঃখ কষ্ট নির্যাতন ভোগ করতে হলেও শেষ পর্যন্ত সাধুতারই জয় হয়। সাধু ব্যক্তি নিঃস্বার্থ বলে তার শত্রু কম। একান্ত ঈর্ষাপরায়ণ ব্যক্তি ছাড়া সৎজীবন যাপনকারীর সাধুতা ও সততা সম্পর্কে কেউ অবিশ্বাসী হয় না। সৎ ও সাধু

জীবনাচরণে অভ্যস্ত ব্যক্তি নির্মল জীবনের আনন্দ পেয়ে থাকে। ব্যক্তিগতভাবে যেমন তেমন জাতীয়ভাবেও সততা ও সাধুতা উন্নতিতে সহায়তা করে।

৩

দুঃখের মত বড় পরশ পাথর আর নাই

সঙ্কেত ঃ দুঃখ মানুষকে সচেতন করে। আমরা সব সময়ই সুখ চাই – কিন্তু দুঃখ সব সময় সুখের পাশাপাশিই থাকে। দুঃখ মানুষের সংগ্রামী চেতনাকে শাণিত করে। দুঃখ জড়তা ও স্থবিরতা থেকে মুক্তি দেয়। দুঃখের আগুণে পুড়ে মানুষ বৃহৎ ও মহৎকে অনুভব করতে পারে।

পরশ পাথর হচ্ছে সেই পাথর – যা দিয়ে অন্য ধাতুকে ারর্শ করলে তা সোনায় রূপান্তরিত হয়। দুঃখ তেমনি পরশ পাথর। এর ছোঁয়ার মানুষ হয় মূল্যবান ও সোনার মত নিখাদ। দুঃখের ারর্শে সামান্য মানুষ হয় অসামান্য।

৪

তেলা মাথায় তেল দেওয়া মনুষ্য জাতির রোগ, দরিদ্রের ক্ষুধা কেহ বুঝে না।

সঙ্কেত – তেলা মাথায় তেল দেওয়া একটি বাংলা প্রবাদ। আমাদের সমাজে ধনী ও বিত্তশালী মানুষ যাদের প্রচুর ধনসম্পদ আছে তাদেরই খাতির যত্ন বেশি করে। বিনা প্রয়োজনে তাদের তোয়াজ তোষামোদ করা হয়। অপ্রয়োজনে তাদের সাহায্য করার জন্য মানুষ এগিয়ে আসে।

সমাজে ধনী ছাড়াও আছে দরিদ্র মানুষ। অনেক দিনই তাদের ক্ষুধার অন্ন, পরিধেয় বস্ত্র জোগাড় হয় না। নানারকম অভাবের তাড়নায় তারা দিশেহারা। এ সমস্ত মানুষকে কিন্তু আমরা সাহায্য করি না। হয়তো তাদের কাছে প্রতিদান পাওয়া যাবে না অথবা দীন দরিদ্র মানুষ আমাদের ক্ষতি করতে পারবে না বলেই তাদের আমরা তুচ্ছ করি। পক্ষান্তরে যাদের সাহায্যের দরকার নেই এবং যারা ধনী ও ক্ষমতার অধিকারী আমাদের ক্ষতি করতে পারে, তাদেরই তোয়াজ তোষামোদ করি।

৫

দন্ডিতের সাথে
দন্ডদাতা কাঁদে যবে সমান আঘাতে
সর্বশ্রেষ্ঠ সে বিচার।

মানুষ সমাজের বিকাশ সাধন করেছে। সমাজকে গতিশীল ও শৃঙ্খলামন্ডিত রাখার জন্য নিয়ম কানুন তৈরি করেছে। সমাজের নিয়মভঙ্গকারীকে শাস্তিদানের ব্যবস্থাও রেখেছে। দন্ডিত যেন সংশোধিত হতে পারে সেজন্যই তাকে দন্ডদান। দন্ডিতের প্রতি কোন আক্রোশ অথবা প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য দন্ডদান করা হয় না। বিচারক বা দন্ডদাতা নিষ্ঠুর হন না। বৃহত্তর কর্তব্য সাধনের জন্যই তিনি দন্ডদান করেন। দন্ডিত দন্ড ভোগের ভয়ে কাঁদে। দন্ডদাতা দন্ডিতের মতই সমান আঘাতে কাঁদেন। দুজনেই যখন কাঁদেন তখন তা হয় শ্রেষ্ঠ বিচার।

৬

চন্দ্র কহে, বিশ্বে আলো দিয়েছি ছড়ায়ে কলঙ্ক যা আছে তা আছে মোর গায়ে।

সূদূরের চাঁদ পৃথিবীকে আলো দেয়। তার গায়ে যে কলঙ্কের ছাপ আছে তা পৃথিবীকে স্পর্শ করে না।
মানব সমাজে কিছু মানুষ আছে যারা চাঁদের আলো বিকীরণ করার মতই নিজেকে বিলিয়ে দেয় জগতের কল্যাণে। যা কিছু সহায় সামর্থ্য অকাতরে তা তারা বিলিয়ে দেয়। নিজেদের দুঃখ বেদনা অপূর্ণতা ও ব্যর্থতাকে চেপে রেখে জগতের কল্যাণে, মানুষের কল্যাণে তাঁরা কাজ করে যান।

৭

যত বড় হোক ইন্দ্রধনু সে
সুদূর আকাশে আঁকা
আমি ভালবাসি মোর ধরনীর
প্রজাপতিটির পাখা।

কল্পনা ও বাস্তবে অনেক পার্থক্য। আকাশের ইন্দ্রধনু যত মায়াবী হোক তা ধরাছোয়ার বাইরে। দূর থেকে তাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখতে পারি। রঙিন প্রজাপতি কিন্তু বাস্তব এবং আমাদের প্রতিদিনের দেখা ধরনীর অধিবাসী। পৃথিবীর রূপ সৌন্দর্যকেই আমরা ভালবাসি। দূরের মোহনীয় সৌন্দর্য অপেক্ষা নিকটের সৌন্দর্য অনেক আকর্ষণীয়।

৮

দ্বার বন্ধ করে দিয়ে ভ্রমটারে রুটি
সত্য বলে তবে আমি কোথা দিয়ে ঢুকি?

ভ্রম অথবা ভুল কর্মজীবনে হতেই পারে। তবে ভুল হয়েছে বলে মানুষ কর্মত্যাগ করে নিজেকে ঘরে আবদ্ধ করে রাখতে পারে না। ভুলকে রুখতে যেয়ে সত্য যেন হারিয়ে না যায়। ভুলের ভয়ে নিশ্চেষ্ট থাকলে ঠিক কাজটিও তো হবে না।

অনুশীলনী

নিচের ভাবসম্প্রসারণগুলো নিজে নিজে লিখুন

১. মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে।
২. নানান দেশের ভাষা
বিনে স্বদেশী ভাষা, পুরে কি আশা?
৩. যেখানে দেখিবে ছাই উড়াইয়া দেখ তাই
পাইলে পাইতে পার অমূল্য রতন।
৪. পরিশ্রম সৌভাগ্যের প্রসূতি।
৫. পেঁচা রাষ্ট্র করে দেয় পেলে কোন ছুতা
জাননা সূর্যের সাথে আমার শত্রুতা।
৬. যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই
যাহা পাই তাহা চাই না।
৭. জীবে প্রেম করে যেইজন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর

৮. গ্রন্থগত বিদ্যা আর পর হস্তে ধন
নহে বিদ্যা নহে ধন, হলে প্রয়োজন।

৯. শুনহে মানুষ ভাই
সবার উপরে মানুষ সত্য
তাহার উপরে নাই।

১০. মেঘ দেখে কেউ করিসনে ভয়
আড়ালে তার সূর্য হাসে
হারা শশীর হারা হাসি
অন্ধকারেই ফিরে আসে।

পাঠ ২

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি

- সারাংশ ও সারমর্মের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে অবহিত হবেন।
- সারাংশ ও সারমর্ম রচনার দক্ষতা অর্জন করতে পারবেন।

সারাংশ/সারমর্ম

মানুষের সমাজ জীবনে ভাষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আমরা অন্যের সঙ্গে কথা বলি, অন্যকে চিঠিপত্র লিখি। এসবই ভাষার সাহায্যে অন্যের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা। অথবা বলা যেতে পারে নিজের মনের ভাবনা বা ভাব অন্যের মধ্যে সঞ্চারিত করে দেওয়া। একেই বলে ভাবের আদান প্রদান। ভাষা ঠিক এ কাজটিই করে- যাকে আমরা বলতে পারি ভাবের আদান-প্রদান।

ভাব বা ভাবনা সব সময় একরকম হয় না। তাই এর ভাষাও একরকম হয় না। তাছাড়া যা বলছি বা যা লিখছি অবস্থাভেদে তার গভীরতা ও বিস্তৃতি সব সময় সমান হয় না। আমরা কম-বেশি সবাই রেডিও, টিভি শুনি ও দেখি। আপনি নিশ্চয় খেয়াল করে দেখেছেন যখন আমরা সংবাদ শুনি তখন সংবাদের মূল কথাগুলিই মাত্র শুনি। যেমন ধরা যাক একটি সংবাদ " আজ সকাল ৫টায় চট্টগ্রাম সমুদ্র উপকূলে প্রবল ঘূর্ণিঝড় আঘাত হেনেছে। এখন পর্যন্ত হতাহত ও ক্ষয়ক্ষতির বিবরণ আমাদের হাতে এসে পৌঁছেনি।" এ দুবাক্যের সংবাদের উপর যখন সংবাদ ভাষ্য বা বিবরণ প্রকাশ করা হয় তখন কিন্তু অনেক বেশি কথা বলা হয়। যেমন ধরুন ঘুর্ণিঝড় সতর্ক সঙ্কেত দেওয়া হয়েছে কিনা, ঘুর্ণিঝড় পূর্ব কি কি সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে, উপকূলে কতটা বিস্তৃত অঞ্চলে ঝড়টি আঘাত হেনেছে, আঘাত হানার আগে সারাদিনের আবহাওয়া কেমন ছিল, যে অঞ্চলে আঘাত হেনেছে সেখানে আশ্রয় কেন্দ্র আছে কিনা ইত্যাদি। সংবাদ ও সংবাদভাষ্যের মূল বক্তব্য এক হলেও ভাবপ্রকাশে ভাষার পরিস্থিতি অনেক পার্থক্য আছে। অর্থাৎ জানা গেল প্রয়োজন অনুযায়ী আমরা বক্তব্যের মূল ভাবকে কখনও ছোট করে উপস্থাপন করি কখনও বিস্তৃত বা বড় করে উপস্থাপন করি। আবার দেখুন আমরা যখন লিখি তখনও ছোট বড়র ব্যাপারটিকে অনুসরণ করি। যেমন ধরুন টেলিগ্রাম ও চিঠির কথা। একই ভাব বা বক্তব্য দুটো মাধ্যমেই পাঠানো যায়। যদি একটি টেলিগ্রাম হয় এরকম মা অসুস্থ, তাড়াতাড়ি এসো। টেলিগ্রামের ঠিক এ বক্তব্যকে যদি আমরা চিঠিতে পুরে পাঠাই তবে অবশ্যই আমরা আরও বিস্তৃত করে লিখি। চিঠিপত্রের আঙ্গিক বা কাঠামো অনুসরণ করেই মূল বক্তব্যের সঙ্গে নিশ্চয় আমরা আরও লিখব - মা কবে থেকে অসুস্থ, কি ধরনের অসুখ, ডাক্তার দেখেছেন, হাসপাতালে স্থানান্তর করতে হবে কিনা ইত্যাদি আরও জরুরি বিষয়।

উপরের আলোচনা থেকে একটি বিষয় জানা গেল – প্রয়োজনমত ভাষাকে আমরা ব্যবহার করি। মূল ভাব বা ভাবনা কখনও সংক্ষিপ্ত করেও কখনও বিস্তৃত করে প্রকাশ করতে পারি। ভাষার অনেক গুণের মধ্যে এটি একটি প্রধান গুণ যে ভাষাকে আমরা সংক্ষিপ্ত অথবা বিস্তৃত দুভাবেই প্রয়োগ করতে পারি। ভাষার এগুণ আমাদের ব্যবহারিক জীবনের জন্য খুবই প্রয়োজনীয়।

সারাংশে ও ভাবসম্প্রসারণ লিখন প্রকৃতপক্ষে ভাষার সংক্ষিপ্ত ও বিস্তৃত করে লেখার পদ্ধতির নাম। আগে যেমন আমরা দেখলাম একটি বিষয়কে প্রয়োজন মোতাবেক সংক্ষিপ্ত বা ছোট করে এবং বিস্তৃত বা বড় করে লেখা যায়। সাধারণভাবে সংক্ষিপ্ত বা ছোট করে লেখার নামই সারাংশ আর বিস্তৃত বা বড় করে লেখার নামই ভাবসম্প্রসারণ। ব্যবহারিক জীবনের প্রয়োজনেই ভাষার এ গুণকে আমাদের আয়ত্ত করতে হবে। সঠিকভাবে সারাংশ ও ভাবসম্প্রসারণ লিখনের জন্য আমাদের বিশেষ কতকগুলো দিকে নজর রাখতে হবে।

সারাংশ শব্দের অর্থ 'সার' অংশ বা 'মূল' অংশ। যে কোন একটি লেখা পড়লে আমরা দেখতে পাই, লেখকের মনের মূলভাবটিকে ফুটিয়ে তোলার জন্য মূল ভাবের সহায়ক অনেক কথা বলতে হয়। একটি ভাবকে যথার্থ ও সঠিকভাবে ফুটিয়ে তোলার জন্য উপমা, উদাহরণ ইত্যাদি প্রয়োজন হয়। সে লেখাটির মূল কথা বা সার কথা বা সারবস্তুই আসলে সারাংশ। ইংরেজিতে তিনটি শব্দ আমরা লক্ষ করি Summary, Substance ও Precis এ শব্দগুলোর যথার্থ বাংলা শব্দ নাই। এ শব্দটির সঙ্গে ভাব অনুষঙ্গও এক নয়। এ তিনটি ইংরেজি শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ সারাংশ নয়। তবে সারাংশ বলতে যে কাজটি বোঝায় তার সঙ্গে ঐ শব্দগুলোর মিল আছে। Summary লিখতে বললে মূল অংশের অর্ধেক, Substance এ মূলের এক তৃতীয়াংশে বা তিন ভাগের এক ভাগ ও Precis মূল অংশের চার ভাগের একভাগ লিখতে হয় Precis এ একটি শিরোনাম ও দিতে হয়। সারাংশ লিখতে আমরা মূল অংশের তিন ভাগের এক ভাগ লেখা উচিত। তবে সারাংশের আকৃতির দিকে যেমন নজর দিতে হবে তেমন নজর দিতে হবে তার প্রকৃতির দিকেও। সারাংশে মূলভাবটি যথার্থ ও সংক্ষিপ্তভাবে প্রকাশ করাটাই মূল বিষয়। বাহুল্য কথার মধ্য থেকে মূল কথাটি খুঁজে বের করাই সারাংশ লেখার উদ্দেশ্য।

সারাংশ লিখন চর্চার জন্য নিম্নলিখিত নিয়মগুলো মেনে চলতে হবে।

১. প্রদত্ত অনুচ্ছেদ অথবা কবিতাংশটি বারবার পড়ে মূলভাবটি বোঝার চেষ্টা করতে হবে।
২. উদ্ধৃত অংশের মূলভাবের বাক্য/বাক্যগুলি চিহ্নিত করুন।
৩. উপমা, উদাহরণ, উদ্ধৃতি ও রূপক আলাদাভাবে চিহ্নিত করুন।
৪. সারাংশ লিখনের সময় লেখার আয়তনের দিকে লক্ষ্য রাখুন।
৫. মূলভাবটি যথাযথ ও সহজ বাক্যবিন্যাসে লিখুন।
৬. উপমা, রূপক উদ্ধৃতসহ সকল বাহুল্য বর্জন করুন।
৭. একই কথার পুনরাবৃত্তি না হয় সেদিকে লক্ষ্য করুন।
৮. উদ্ধৃতাংশটি কোন কবি বা লেখকের সেটি বলার দরকার নেই।
৯. প্রথম বাক্যটি হবে সহজ সরল ও মূলভাবের প্রতি নির্দেশক।
১০. সারাংশটি লেখা হলে কয়েকবার পড়ে নিশ্চিত হন যে প্রয়োজনীয় কোন কিছু বাদ যায়নি।

ভাষায় দক্ষতা অর্জনের জন্য অনুশীলন প্রয়োজন। সারাংশ রচনায় ভাষা পড়ে বুঝতে পারা ও সংক্ষিপ্ত করে লেখা এ দুটি বিষয়ের দক্ষতা প্রয়োজন হয়। এ দক্ষতা অর্জন করতে হলে সারাংশ রচনার অনুশীলন করতে হবে।

সারাংশ রচনার নমুনাগুলো ভাল করে পড়ুন

১

কুকুর আসিয়া এমন কামড় দিল পথিকের পায়,
কামড়ের চোটে বিষ দাঁত ফুটে বিষ লেগে গেল তায়।
ঘরে ফিরে এসে রাত্রে বেচারা বিষম ব্যথায় জাগে,
মেয়েটি তাহার, তারি সাথে হায়, জাগে শিয়রের আগে।
বাপেরে বলে সে ভৎর্সনা ছলে কপালে রাখিয়া হাত,
"তুমি কেন্ বাবা ছেড়ে দিলে তারে, তোমার কি নেই দাঁত"
কষ্টে হাসিয়া আর্ত কহিল, "তুই রে হাসালি মোরে,
দাঁত আছে বলে কুকুরের পায় দংশি কেমন করে?
কুকুরের কাজ কুকুরের করেছে কামড় দিয়েছে পায়,
তাই বলে কুকুরের কামড়ানো কি রে মানুষে শোভা যায়?

সারমর্ম ঃ ক্ষমা মানুষের চরিত্রের একটি প্রধান গুণ। কোন হীন ও নীচ ব্যক্তি তাঁর অনিষ্ট করলেও তিনি রাগান্বিত হয় প্রতিশোধ গ্রহণ করেন না। তিনি বরং ক্রোধকে দমন করে উদারতার পরিচয় দেন। তিনি জানেন হীন ও নীচের মত ব্যবহার করলে নিজেকেও হীন হয়ে যেতে হয়। তাই তিনি তা করেন না।

২

মহাসমুদ্রের শত বৎসরের কল্লোল কেহ যদি এমন করিয়া বাঁধিয়া রাখিতে পারিত যে, সে ঘুমাইয়া পড়া শিশুটির মতো চুপ করিয়া থাকিত, তবে সেই নীরব মহাশব্দের সহিত এই লাইব্রেরীর তুলনা হইত। এখানে ভাষা চুপ করিয়া আছে, প্রবাহ স্থির হইয়া আছে, মানবাত্মা অমর আলোকে কালো অক্ষরের শিকলে কাগজের কারাগারে বাঁধা পড়িয়া আছে। ইহারা যদি সহসা বিদ্রোহী হইয়া উঠে, নিস্তব্ধতা ভাঙ্গিয়া ফেলে, অক্ষরের বেড়া ভঙ্গ করিয়া একেবারে বাহির হইয়া আসে। হিমালয়ের উপরে কঠিন বরফের মধ্যে যেমন কত শত বন্যা বাঁধা আছে, তেমনি এই লাইব্রেরীর মধ্যে মানব-হৃদয়ের বন্যাকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে।

বিদ্যুৎ মানুষ লোহার তার দিয়া বাঁধিয়াছে। কিন্তু কে জানিতে মানুষ শব্দকে নিঃশব্দের মধ্যে বাঁধিতে পারিবে। কিন্তু কে জানত সঙ্গীতকে, হৃদয়ের আশাকে, জাগ্রত আত্মা আনন্দধ্বনিকে, আকাশের দৈববাণীকে সে কাগজে পুরিয়া রাখিবে। কে জানিতো মানুষ অতীতকে বর্তমানে বন্দী রাখিবে। অতলারর্শী কালো সমুদ্রের উপর কেবল একখানা বই দিয়া সাঁকো বাঁধিয়া দিবে।

সারাংশ ঃ বহু যুগের বহু কবি, লেখক, শিল্পী, চিন্তাবিদের কথা কল্পনা, আশা আকাঙ্খা বইয়ের মধ্যে লিখিত হয়ে আছে। মহাসাগরের বুকে যেমন আছে তরঙ্গের ধ্বনি তেমনি মানব সমাজে আছে আনন্দ বেদনার মত্তকোলাহল। মানুষ এসবকেই কালো অক্ষরে বইয়ের মধ্যে আবদ্ধ করে রেখেছে। সমুদ্র তরঙ্গের মত বইয়ের ভিতরে আছে কোলাহল যদি শোনা যেত তাহলে তা কি প্রচন্ড তা অনুভব করা যেত। মানুষ যেমন বিদ্যুৎকে লোহার তারে বেঁধেছে তেমনি মানুষ তার ভাব ও ভাবনাকে কালো অক্ষরে বেঁধে রেখেছে। অতীত ও বর্তমানের সঙ্গে মানুষ বই দিয়ে সেতু রচনা করেছে।

৩

হে দারিদ্র্য, তুমি মোরে করেছ মহান!
তুমি মোরে দানিয়াছ খ্রীষ্টের সম্মান,
কণ্টক-মুকুট শোভা: দিয়াছ তাপস,
অসঙ্কোচ প্রকাশের দুরন্ত সাহস
উদ্ধত উলঙ্গ দৃষ্টি, বাণী খুরধার
বাণী মোর শাপে হর তরবার।
দুঃসহ দাহনে তব হে দর্পী তাপস,
ম্লান স্বর্গেরে মোর করিলে বিরস,
অকালে শুকালে মোর রূপ-রস-প্রাণ
শীর্ণ করপুট ভরি সুন্দরের দান
যতবার নিতে যাই-হে বুভুক্ষু, তুমি
অগ্রে আসি, কর পান! শুন্য মরুভূমি
হেরি মম কল্পলোক।

সারমর্ম ঃ দারিদ্র্যের জ্বালাযন্ত্রণায় পৃথিবী বিরস হয়ে উঠেছে। দারিদ্র্য জীবনকে করেছে সৌন্দর্যহীন ও কুৎসিত। কিন্তু এ দারিদ্র্যই আবার দিয়েছে ারষ্ট বলার দুরন্ত সাহস। বাণীকে করেছে খ্রিস্ট্রের মত সম্মান। অকামে শুকিয়ে দিয়েছে জীবনের রস, রূপ, প্রাণ। দারিদ্র্যের অভিশাপে বীণা হয়েছে তরবারি।

৪

বহুদিন ধরে বহুক্রোশ দূরে
বহু ব্যয় করি বহু দেশ ঘুরে
দেখিতে গিয়াছি পর্বতমালা,
দেখিতে গিয়াছি সিন্ধু।
দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া
ঘর হতে শুধু দুইপা ফেলিয়া
একটি ধানের শীষের উপর
একটি শিশির বিন্দু।

সারমর্ম ঃ মানুষ অনেক কষ্ট করে অনেক অর্থ ব্যয় করে পর্বত, সমুদ্র প্রভৃতি দেখতে যায়। কিন্তু ঘরের কাছেই ধানের শীষের উপর শিশির বিন্দুর যে সৌন্দর্য তা দেখা হয় না। সৌন্দর্য শুধু বহুবিস্তৃত অদেখা দেশ ও জনপদেই থাকে না - নিজের দেশের গন্ডিতে ও নিজ লোকালয়েও সৌন্দর্যের বিচিত্র বিকাশ দেখতে পাওয়া যায়।

৫

সার্থক জনম মোর জন্মেছি এই দেশে
সার্থক জনম মাগো, তোমায় ভালবেসে।
জানি না তোর ধন রতন আছে কিনা রাণীর মতন,
শুধু জানি আমার অঙ্গ জুড়ায় তোমার ছায়ায় বসে।
কোন বনেতে জানিনে ফুল গন্ধে এমন করে আকুল

কোন বনেতে উঠেরে চাঁদ এমন হাসি হেসে।

সারাংশ ঃ জন্মভূমি সকলের কাছেই অত্যন্ত প্রিয়। জন্মভূমি ধনী না দরিদ্র এটা বিবেচনা না করেই সকলে গভীরভাবে স্বদেশকে জন্মভূমিকে ভালবাসে। মাতৃভূমির মত এত সুন্দর দেশ পৃথিবীর আর কোথাও আছে বলে মনে হয় না। তাই জন্মভূমির সৌন্দর্যে হৃদয় মন জুড়িয়ে যায়। জন্মভূমিতে মৃত্যুবরণ করতে পারাও একটা আনন্দের ব্যাপার বলে মনে হয়।

৬

বার্ধক্য তাহাই - যাহা পুরাতনকে, মিথ্যাকে, মৃতকে আঁকড়াইয়া পড়িয়া থাকে। বৃদ্ধ তাহারাই-যাহারা মায়াচ্ছন্ন, নবমানবের অভিনব জয়যাত্রার-শুধু বোঝা নয়, বিঘ্ন, শতাব্দীর নবযাত্রীর চলার ছন্দে ছন্দ মিলাইয়া যাহারা কুচকাওয়াজ করিতে জানে না, পারে না, যাহারা জীব হইয়াও জড়, যাহারা অটল সংসারের পাষাণস্তূপ আঁকড়াইয়া বসিয়া আছে। বৃদ্ধ তাহারাই যাহারা নিদ্রাভঙ্গের ভয়ে দ্বার রুদ্ধ করিয়া পড়িয়া থাকে; আলোক-পিয়াসী প্রাণচঞ্চল শিশুদের কলকোলাহলকে যাহারা বিরক্ত হইয়া অভিসম্পাত করিতে থাকে। জীর্ণ পুঁথি চাপা পড়িয়া যাহাদের নাভিশ্বাস উঠিয়াছে, জ্ঞানের অগ্নিমান্দ্যে যাহার আজ কঙ্কালসার, বৃদ্ধ তাহারাই। বহু যুবককে দেখিয়াছি যাহাদের যৌবনের উর্দির নীচে বার্ধক্যের কঙ্কালমূর্তি। আবার বহু বৃদ্ধকে দেখিয়াছি, যাহাদের বার্ধক্যের জীর্ণাবরণের তলে মেঘলুপ্ত সূর্যের মতো প্রদীপ্ত যৌবন।

সারাংশ ঃ বার্ধক্য ও যৌবন বয়স দিয়ে নির্ণয় করা যায় না। পুরাতন ও মিথ্যাকে যাঁরা আঁকড়ে থাকে তারাই বৃদ্ধ। যারা সংস্কারে আবদ্ধ, জড়তায় স্থবির, প্রাণ কোলাহলে ও নতুনত্বে ভীত তারাই বৃদ্ধ। নতুন যুগ ও জীবনকে যারা গ্রহণ করতে পারে না বয়সে তারা যুবক হলেও বার্ধক্য তাদের গ্রাস করেছে। বয়সে জীবনের অগ্রগতিকে যারা সাগ্রহে গ্রহণ করতে পারে তারাও যৌবন ও তারুণ্যের প্রভাব আলোকিত।

৭

পরের মুখে শেখা বুলি পাখির মত কেন বলিস?
পরের ভঙ্গি নকল করে নটের মত কেন চলিস?
তোর নিজস্ব সর্বাঙ্গে তোর দিলেন ধাতা আপন হাতে
মুছে সেটুকু বাজে হলি, গৌরব কিছু বাড়ল তাতে?
আপনারে যে ভেঙ্গে চুরে গড়তে চায় পরের ছাঁচে
অলীক ফাঁকি, মেকি সেজন - নামটা তার কদিন বাঁচে?

সারাংশ ঃ সব মানুষেরই নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য আছে। পরের ভাষা, ভঙ্গি, চলা, বলা নকল করে মানুষ সং সাজতে পারে। এতে করে নিজেকে নিজে অপমান করা হয়। বিধাতা সবাইকে আপন বৈশিষ্ট্য দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। পরের অনুকরণ করলে নিজস্ব গুণ ও জ্ঞানের বিকাশ ঘটে না।

৮

থাকবো নাক বন্ধ ঘরে, দেখবো এবার জগৎটাকে
কেমন করে, ঘুরছে মানুষ যুগান্তরের ঘুর্ণিপাকে।
দেশ হতে দেশ দেশান্তরে ছুটছে তারা কেমন করে
কিসের নেশায় কেমন করে মরছে যে বীর লাখে লাখে
কিসের আশায় করছে তারা বরণ মরণ যন্ত্রণাকে।

কেমন করে পারলে পাথার লক্ষ্মী উঠেন পাতাল ফুঁড়ে
কিসের অভিমানে মানুষ চড়ছে হিমালয়ের চূড়ে
তুহিন মেরু পার হয়ে যায় সন্ধানীরা কিসের আশায়?
হাউই চলে চায় যেতে কে চন্দ্রলোকের অচিনপুরে
শুনব আমি ইঙ্গিত কোন 'মঙ্গল' হতে আসছে উড়ে।

সারাংশ ঃ মানুষ ঘরকুণো নয়। প্রকৃতির রহস্যময়তা তাকে হাতচানি দিয়ে ডাকে। অজানা দেশ, পাহাড় পর্বত, মরুভূমি, জনপদের মানুষকে জানার আশায় মানুষ চিরকাল ছুটছে। বাধাবিপত্তি এমন কি মৃত্যুও মানুষকে এ ছুটে চলা থেকে বিরত করতে পারেনি। অতল গভীর সমুদ্র থেকে হিমালয়ের চূড়াপর্বত সর্বত্রই মানুষের গতিবিধি। চাঁদের অচিন লোক থেকে দূরগ্রহের অন্বেষণে মানুষ মরণ পণ করে ছুটছে। অজানাকে জানা, অদেখাকে দেখা মানুষের চিরকালের ব্রত।

৯

আমার বিশ্বাস, শিক্ষা কেউ কাউকে দিতে পারে না। সুশিক্ষিত লোকমাত্রেই স্বশিক্ষিত। আজকের বাজারে বিদ্যাদাতার অভাব নেই, এমন কি এক্ষেত্রে দাতকর্ণেরও অভাব নেই। এবং আমরা আমাদের ছেলেদের তাঁদের দ্বারস্থ করেই নিশ্চিত থাকি, এই বিশ্বাসে যে, যেখানে থেকে তারা একটা বিদ্যার ধন লাভ করে ফিরে আসবে, যার সুদে বাকী জীবন আরামে কাটিয়ে দিতে পারবে। কিন্তু এ বিশ্বাস নিতান্ত অমূলক। মনোরাজ্যেও দান গ্রহণ সাপেক্ষ; অথচ আমরা দাতার মুখ চেয়ে গ্রহীতার কথাটা একেবারে ভুলে যাই। এ সত্য ভুলে না গেলে আমরা বুঝতুম যে, শিক্ষকের সার্থকতা শিক্ষাদান করায় নয় - ছাত্রকে তা অর্জন করতে সক্ষম করায়। শিক্ষক শিক্ষার পথ দেখিয়ে দিতে পারেন। মনোরাজ্যের ঐশ্বয্যের সন্ধান দিতে পারেন, তার কৌতূহল উদ্যেক করতে পারেন, তার বুদ্ধি বৃত্তিকে জাগ্রত করতে পারেন, তার জ্ঞান পিপাসাকে জাগ্রত করতে পারেন এর বেশি আর কিছু পারেন না।

সারাংশ ঃ শিক্ষা কেউ কাউকে দিতে পারে না। শিক্ষা নিজেকে অর্জন করতে হয়। তাই সুশিক্ষিত লোকমাত্রই নিজের দ্বারা নিজে শিক্ষিতা। শিক্ষক কাউকে বিদ্বান অথবা শিক্ষিত করে তুলতে পারেন না। ছাত্র যাতে শিক্ষা অর্জন করার যোগ্য হয়ে উঠে এটিই শিক্ষকের লক্ষ। শিক্ষক শিক্ষার্থীর কৌতূহলকে উদ্দীপ্ত করতে পারেন। বুদ্ধিবৃত্তিকে জাগিয়ে দিতে পারেন, জ্ঞানের পিপাসাকে বাড়িয়ে দিতে পারেন। এক কথায় শিক্ষার্থীর অন্তরের সুপ্ত শক্তিগুলোকে শিক্ষক জাগিয়ে তুলতে পারেন। বিদ্যার সাধনার কাজটি শিক্ষার্থীকেই করতে হয়।